৭ চর্যাপদের সাহিত্য মূল্য,

সাহিত্য জীবনকে নিয়ে। সেই জীবন যাকে ঘিরে পারি-পার্শ্বিককে অবলম্বন করে, কবি শুধু মনোযোগে সেই পরিবেশে লালিত জীবনের বর্ণনা দেন তাঁর রচনায়। কেবল তত্ত্বকথা বা আত্মদর্শন সাহিত্যিকে উপজীব্য নয়। কবি তাঁর কাব্যে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কাব্যকে যথোচিত রসোত্তীর্ণ করেন। পাঠক কাব্য পাঠে আনন্দ লাভ করেন।

চর্যাপদের কবিরা কিন্তু তাঁদের ধর্মীয় তত্ত্বকথাকে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত করে দেওয়ার জন্য পদগুলি লিখেছিলেন। চর্যাপদকারটি প্রায় ২৪ জন কবি প্রত্যেকেই এক একজন সহজিয়া সাধক। গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্ম ~~কালক্রমে~~ কালের নিয়মে নানা উপশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। তার মধ্যে একটি শাখার নাম সহজযান। সেই সহজযানের সাধন তত্ত্বের কথাই বর্ণিত হয়েছে পদগুলিতে, সেই অর্থে চর্যাপদ সাহিত্য মূল্য বর্জিত।

~~কিন্তু চর্যাপদের কবিরা সাধক হলেও তাদের অন্তর্নিহিত ...~~

কিন্তু চর্যাপদের কবিরা কবিত্ব শক্তির অধিকারী হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। কবিরা তাদের ধর্মীয় তত্ত্বকথাকে ~~প্রকাশ করেছেন~~ প্রকাশ করেছেন সংকেতের আশ্রয় নিয়ে, প্রতীকের আশ্রয় নিয়ে, সন্ধ্যা ভাষার আশ্রয় নিয়ে। পদগুলির ভিতরের অর্থ এক

Scanned with CamScanner

তার বাইরের অর্থ অন্য। কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থকে যুক্ত করার জন্য সাধন পদ্ধতিকে কবিরা ও মানব জীবনের আশ্রয় নিয়েছেন। বাইরের অর্থ বিবেচনাই পদগুলিকে ডার্টিক্য বলে মেনে নেওয়া যায়।

(চ) সাহিত্য বিশেষ করে কবিতায় অলংকারের ব্যবহারের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। বক্তব্যকে হৃদয়গ্রাহী ও মনোহারিণী করে তোলার জন্য নানা ধরনের অলংকারের আশ্রয় নেন। চর্যাপদের উপমা, রূপক, অতিশয়োক্তি এমনকি বিরোধ অলংকারের প্রয়োগ দেখা যায়।

৮নং পদে 'সোনে ভরিতী করুণা নাবী
রূপা থোই নাহিক ঠাবী'। —

কবিতাংশে সুন্দর ভাবে রূপক অলংকারের প্রয়োগ হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী
আমারই সোনার ধানে গিয়াছে ভরি' মিল রয়েছে।

৪১নং পদে উপমা অলংকার সৃষ্টি করেছেন নতুন নতুন উপমা দিয়ে — 'অপে পাষাণ', 'বান্ধুলা জল'।

৬নং পদে অতিশয়োক্তি অলংকারের আড়ালে বক্তব্যকে গোপন করা হয়েছে —

৩৩নং পদে 'টি' বিরোধী দেখে দিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি করা হয়েছে। পরে সে বিরোধের অবসান ঘটেছে — 'দি চরিল চুঁই কি বেন্টে ~~সামন~~ সমাধা'

কবিতার প্রধান গুণ ছন্দ। পদকর্তাদের ছন্দজ্ঞান যথেষ্টই ছিল। সংস্কৃত ছন্দ প্রাকৃত ছন্দ সম্পর্কে তাদের ধারণা যথাযথ ছিল।

চর্যার প্রথম ~~পদ~~ পদটি অপভ্রংশের পাদাকুলক ছন্দরীতিতে গড়ে উঠেছে :—

২ ২ ১১ ১১ | ২১ ১ ২ ২
কাআ তরুবর | পঞ্চবি ডাল । = ~~৪৪~~ ৪+৪/৪+৪
২ ১ ১ ২ ২ | ১ ১ ২ ২ ২
চঞ্চল চীএ | পইঠো কাল ॥ = ৪+৪/৪+৪

ছন্দটিতে বাঙালীর উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে।

কোথাও কোথাও পয়ারের আভাস আছে :—

২ ১ ১১১ ১১ | ১১১১ ১১১
জাম মরণ ভব / কইসন হোই। = ৮/৬

কোথাও কোথাও ত্রিপদীর আভাস আছে :—

রাউতু ভণই কট   ভুসুকু ভণই কট —
সঅলা অইস সহাব।

কাব্য শরীর যে প্রতীকী শব্দ দিয়ে আভিপ্রায়িক অর্থযুক্ত করে দিয়ে আবেগে চিত্ত পাঠকে তা রসোত্তীর্ণ হয়।

কবিরা তা পেরেছেন। যেমন একটি উদাহরণ — 'তোকলা সাঙ্গে ন হবিন ~~কাজ~~ বেঁ

হরিনাম আভিপ্রায়িক অর্থের জন্য চৈতন্য-দেবকেন্দ্র।

সাহিত্য মানুষ সমাজ জীবনকে দেখে, অন্য সমাজের মানুষকে দেখে। বৈষ্ণবের নীতু কাছে জীবন ও জীবিকা সুন্দর ভাবে ধরা হয়েছে। ~~অসাধারণ~~ জনে জন্মে ধর্ম নদীয়ায় লীন বাংলা দেশের একটি চৈতন্যমূর্তি আমরা খুঁজে পাই। ~~যেমন~~ সেই ধর্মীয় কোমলও কোমল চিত্র বৈষ্ণবীর সাহিত্য মেলে :—

ভবনেই গহন-গম্ভীর বেণু বাঁশী।
5 আছে চিরদিন মানুষ ন থাকী।। [illegible]

সাহিত্যের একটি Form হল লোক সঙ্গীত ও আধুনিক কালের সৃষ্টি। বৈষ্ণব পদ কাব্যে ও মঙ্গলকাব্যে লোক সঙ্গীতের সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

দেশ-কাল-সমাজ : চর্যাপদের সমাজচিত্র

কাব্যের উদ্দেশ্য সামাজিক ইতিহাস প্রণয়ন না হলেও কাব্য যেহেতু জীবন-নির্ভর সেইজন্য কাব্যের মধ্যে জীবনের বাস্তব পটভূমি তথা সমাজ-পরিবেশ-সংক্রান্ত তথ্যাদি সন্ধান করলে ইতিহাসবেত্তারা একেবারে বিফল হন না। চর্যাগীতির মূল বিষয় অবশ্য জীবনের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত বা সামাজিক সংস্থানের সঙ্গে অন্বিত নয়, বরং চর্যাকারদের দৃষ্টিভঙ্গী তত্ত্বের দিক থেকে জীবন-বিমুখ ছিল বলেই বলা চলে। সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশায় ভরা এই যে রক্তমাংসের জীবন চর্যাকারদের কাছে তা 'সুইণে অদশ জইসা'—স্বপ্নের ছবি ও দর্পণের প্রতিবিম্বের মতই সত্য বলে মনে হলেও আসলে সত্য নয়। জীবন সম্পর্কে যাঁদের ধারণা এতটা ইহলোক-পরাঙ্মুখ তাঁদের রচনায় সাক্ষাৎভাবে তাঁদের সমসময়িক সমাজজীবনের রূপ-রসের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। তবে চর্যাকারদের রচনারীতি সম্পর্কে একটি কৌতুককর সত্য এই যে, তত্ত্বের দিক থেকে তাঁরা যে জীবনরূপকে অস্বীকার করেছেন, তত্ত্বকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে তাঁরা আবার সেই জীবনরূপ থেকেই উপমান সংগ্রহ করেছেন। অর্থাৎ জীবন যে মিথ্যা একথা প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁরা জীবনের নানা লৌকিক রূপের উপরই সবচেয়ে বেশী নির্ভর করেছেন। তাই সাক্ষাৎভাবে জীবনকে অস্বীকার করেও তাঁরা পরোক্ষভাবে তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। চর্যাগীতিতেও তাই সমাজের ও জীবনের যে রূপ পাওয়া যায় তা পরোক্ষ, খণ্ডিত ও আভাসময়।

ভৌগোলিক পরিবেশ : চর্যাগীতি মূলত বাংলাদেশের বৌদ্ধ সাধকদের সাধনসঙ্গীত, তাই তাঁদের রচনার উপমানব্যবহারে বাংলাদেশের ভৌগোলিক প্রকৃতির প্রভাব সবচেয়ে বেশী। এই ভৌগোলিক প্রকৃতির মধ্যে আবার প্রাধান্য অনুসারে নাব্য ভূপ্রকৃতির স্থান সর্বাগ্রগণ্য। কেন না, বাংলাদেশ বিশেষভাবে নদীমাতৃক,—সমুদ্র নদী খাল বিখালে বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিশেষভাবে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। পরমার্থসাধনার ক্ষেত্রে নদী ও সমুদ্রের রূপক অবশ্য ভারতীয় ভক্তিসাহিত্যে বহুদিন থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে, কিন্তু নদী-খাল-নৌকাচালনা ও সাঁকো-নির্মাণের রূপক চর্যাকারেরা যত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন তার তুলনা অন্য কোথাও নেই। এর কারণ বাংলাদেশের বিশেষ নাব্য প্রকৃতি। চর্যাকার যখন বলেন :

Scanned with CamScanner

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝোঁ ন থাহী ॥(৫)

তখন ভারতীয় সাহিত্যে ব্যবহৃত সাধারণ নদী-রূপক অতিক্রম করে কর্দম-পিচ্ছিল পাড়বিশিষ্ট বাংলাদেশের অথৈ জলের নদীর প্রতিচ্ছবিই বিশেষভাবে ফুটে ওঠে। শুধু নদীই নয়, এ দেশে বাম-ডাহিনে যত্রতত্র খাল-বিখালের যে প্রাচুর্য তারও উল্লেখ আছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে :

বাম দাহিণ জো খালবিখলা।
সরহ ভণই বপা উজুবাট ভাইলা ॥(৩২)

যেখানে এত গভীর জলাশয়ের প্রাচুর্য সেখানে পারাপারের প্রধান উপায় সাঁকো ও নৌকা। চাটিলপাদের গানে এই সাঁকো নির্মাণের বিস্তৃত বিবরণ আছে :

ফাড্ডিঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ।
আদঅ দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোহিঅ ॥(৫)

টাঙ্গি দিয়ে বড়গাছ ফেড়ে কাঠের পাটাতন জোড়া দিয়ে বেশ মজবুত সাঁকো তৈরি করা হয়েছে। সাঁকো স্থলপথের সহায়, কিন্তু নদী-খাল-বিল যেখানে প্রচুর সেখানে সব সময় সাঁকোতে কাজ চলে না, তাই সেকালের লোকে জলে ভেলা বা নৌকা ভাসিয়ে যাতায়াত করত। এই নৌকাযাত্রার ছবিও অনেকগুলি গানে বিশদ ভাবে অঙ্কিত হয়েছে:

Scanned with CamScanner

পাঞ্চ কেডুআল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিটত কাচ্ছী বান্ধী।
গঅণদুখোলেঁ সিংচহু পাণী ন পইসই সান্ধী ॥

উদ্ধৃত গীতাংশগুলির তাত্ত্বিক অর্থ যাই হোক, এগুলির মধ্যে নৌকা বাইবার যে বিস্তারিত বর্ণনা, বিভিন্ন প্রকার নৌকার নাম (নাব, নাবড়ি, ভেলা) এবং নৌকার বিভিন্ন অবয়বের নাম আছে তাতে বাংলাদেশের নাব্য ভূপ্রকৃতি বিশেষ সজীবরূপে ফুটে উঠেছে। চর্যাগীতিতে স্থলপথের যানবাহন হিসাবে রথ (১৪) ও হস্তী (৯,১৬) ব্যবহারের আভাস আছে, কিন্তু রথ অর্থাৎ স্থলযান অপেক্ষা জলযানের শ্রেষ্ঠতা চর্যাগীতির এক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে ('জো রথে চড়িলা বাহবা ণ জাই কুলেঁ কুল বুড়ই'—১৪)। এ থেকেই বোঝা যায় চর্যাকারদের রূপকচিন্তায় স্থলের চেয়ে জলাশয়ের প্রভাবই বেশী।

নদীপ্রসঙ্গের পরই চর্যাগীতিতে পর্বত ও অরণ্যপ্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে। এই উভয় প্রসঙ্গের উল্লেখে বোঝা যায় চর্যাগীতির বাংলাদেশ ভৌগোলিক সীমার দিক থেকে আজকের বাংলা থেকে অনেক বেশী প্রসারিত ছিল। ২৮ সংখ্যক গানে এই পার্বত্য ও আরণ্য প্রকৃতির ছবি আছে :

উঞ্চা উঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥

* * *

ণাণাতরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডলবজ্রধারী ॥

শবর-শবরী বা সমাজে যারা সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, পাহাড়ের গুহা বা মালভূমি এবং সংশ্লিষ্ট বনভূমিই ছিল তাদের আবাসস্থল।

সমাজ-সংস্থান : চর্যাগীতিগুলিতে সেকালের সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক পরিস্থিতির কিছু কিছু আভাস আছে। যে সময়ে এই গানগুলি রচিত হয়েছিল সে সময়ে বাংলাদেশে সেন-রাজবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। সেনবংশের পূর্বেকার বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালবংশীয় রাজারা ধর্ম ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কিছুটা উদারনৈতিক ছিলেন, নিজেরা বৌদ্ধ হলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সম্পর্কে তাঁদের কোন অসহিষ্ণুতার প্রমাণ ইতিহাসে নেই। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী সেনরাজগণ পরধর্ম সম্পর্কে বেশ অসহিষ্ণু ছিলেন এবং তাঁদের আমলেই ব্রাহ্মণ্যস্মৃতির প্রসার ও ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম-প্রথা অনুযায়ী সামাজিক স্তরবিভাগের রীতি বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। এই বর্ণানুযায়ী সমাজব্যবস্থায় বেদাশ্রিত জনগোষ্ঠী ছিল অভিজাত এবং বেদধর্ম ও বেদাচার-বহির্ভূত জনগোষ্ঠী ছিল অনভিজাত, অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য। অভিজাত সমাজ অনভিজাত সমাজ সম্পর্কে সর্বদা একধরনের জুগুপ্সা

Scanned with CamScanner

ও বিরূপতা পোষণ করত। সেকালে রচিত নানা শিলালিপি, তাম্রশাসন এবং স্মৃতিগ্রন্থাদি থেকে সেকালের সমাজব্যবস্থার যে ঐতিহাসিক তথ্যাদি পাওয়া যায় চর্যাগীতির বিভিন্ন অংশে তার পরোক্ষ সমর্থন আছে। চর্যাকারগণ ছিলেন তান্ত্রিক বৌদ্ধ, সুতরাং ধর্মাচারের দিক থেকে তাঁরা বেদবহির্ভূত। এই কারণে চর্যাগীতির রচয়িতারা ডোম্বী, কামলি, শবর প্রমুখ অন্ত্যজ শ্রেণীর ব্যক্তি এবং চর্যাগীতির পাত্রপাত্রীগণও ডোমনী, চণ্ডালী, শুণ্ডিনী, শবরী, শবর, ব্যাধ, জেলে প্রভৃতি অস্পৃশ্য শ্রেণীভুক্ত। সমাজের অভিজাত উচ্চবর্ণীয়েরা যে নিম্নবর্ণীয়দের সম্পর্কে একধরনের শুচিবায়ুগ্রস্ত জুগুপ্সা পোষণ করতেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় কাহ্নপাদের একটি চর্যায় :

নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো বাহ্মনাড়িআ॥

ডোম-চাঁড়াল-শবর প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নবর্ণীয়েরা নগরের বাইরে, জনপদের প্রাণকেন্দ্র থেকে বহুদূরে জঙ্গলের মধ্যে, পাহাড়ের গুহায় কিংবা মালভূমির উপরে বাস করত। ব্রাহ্মণেরা তাদের স্পর্শে সমাজজীবন কলুষিত করতে চাইতেন না বলেই এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা। অবশ্য চর্যাগীতির ডোমনী, শবরী, চণ্ডালী কেউই প্রকৃত নারীচরিত্র নয়, মহাসুখ বা সহজানন্দের রূপকবিগ্রহ। কিন্তু সহজানন্দের অতীন্দ্রিয় স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে চর্যাকবিগণ যে ভাবে অস্পৃশ্য রমণীর রূপক ব্যবহার করেছেন তাতে বোঝা যায় যে সেকালের সমাজব্যবস্থায় এই স্পর্শযোগ্যতার প্রসঙ্গটি কত প্রত্যক্ষ ছিল।

জীবিকা : বর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় নিম্নবর্ণীয়েরা শুধু যে নিম্নতর সমাজমানেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাই নয়, তাঁদের আর্থিক মানও অত্যন্ত অনুন্নত ছিল। চর্যাগীতিতে যেকয়টি জীবিকা বা বৃত্তির ইঙ্গিত আছে তা খুব একটা উচ্চমানের নয়। চর্যাগীতিতে ডোম, ব্যাধ, শুঁড়ি, সূত্রধার ইত্যাদি যেসব বৃত্তিনির্ভর চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় যে সমাজের নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের আর্থিক অবস্থা বিশেষ অনুন্নত ছিল। ডোমদের প্রধান বৃত্তি ছিল তাঁত বোনা ও চাঙাড়ি তৈরি করা (১০), এ ছাড়া খেয়াপারাপার করাও ডোমদের কাজ ছিল। এই পাটনীবৃত্তি খুব একটা অর্থকরী ছিল না, পারাপারের বিনিময়ে পারার্থীর কাছ থেকে পারিশ্রমিক পাওয়া যেত যৎসামান্য—কড়ি বা বুড়ি(১৪)। তাছাড়া পারিশ্রমিক আদায়ের ব্যাপারটিও সবসময় সহজসাধ্য ছিল না। অনেক সময় পারার্থীরা পারিশ্রমিক দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করত, তখন তার শরীর তল্লাশি করে তবে পারিশ্রমিক উদ্ধার করতে হত। ডোমপুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ চরণে নূপুর ও কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করে কাপালিক বেশে নগরের মধ্যে বিহার করত। এই কাপালিক নটবৃত্তিও সেকালের নিম্নবর্ণীয়দের অন্যতম পেশা ছিল। অন্যান্য বৃত্তির মধ্যে মদচোলাই করা (৩), শিকার করা (৬, ২৩), গাছ কেটে কাঠের কাজ করা (৫, ৪৫) তুলো ধোনা ও মোটা কাপড় বোনার কথা (২৬, ২৫) চর্যাগীতিতে উল্লিখিত হয়েছে। এই সব বৃত্তির কথা থেকে বোঝা যায় যে, সমাজের নিম্নস্তরের ব্যক্তিরা সকলেই ছিল শ্রমজীবী, বুদ্ধিচর্চা অপেক্ষা কায়িক শ্রমই ছিল এদের জীবিকার মুখ্য মূলধন।

Scanned with CamScanner

পক্ষান্তরে সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের জীবিকার কথা বিশদ ভাবে উল্লিখিত না হলেও তাঁদের জীবনধারা সম্পর্কে যে সব বিচ্ছিন্ন আভাস পাওয়া যায় তাতে মনে হয় আর্থিক অসাচ্ছল্য তাঁদের ছিল না। যাঁদের ঘরে হরি, হর, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবমূর্তির (৪৭) প্রতিষ্ঠা ছিল অর্থাৎ যাঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাচারের সাপেক্ষতা করতেন আর্থিক ব্যাপারে তাঁদের কায়িক-শ্রমের উপর নির্ভর করতে হত না। আগম-পুথিপাঠ ইষ্টমালা-জপ ইত্যাদি (৪০) বেদানুকূল বুদ্ধিচর্চাতেই তাঁদের সময় অতিবাহিত হত। রাজা শাসনপড়া (=তাম্রশাসন)র দ্বারা তাঁদের যে নিষ্কর ভূসম্পত্তিভোগের অধিকার দিতেন তাতেই তাঁদের অর্থের সংস্থান হত। রাজানুগ্রহে তাঁদের ঘরে থাকত সোনারূপার ভাণ্ডার (৪৯)। কায়িক শ্রম ও শাস্ত্রপাঠাদি বুদ্ধিচর্চা—জীবিকার্জনের এই দুটি ঋজু উপায় ছাড়াও অন্য তির্যক উপায়ও সেকালে বেশ প্রচলিত ছিল—চৌর্যবৃত্তি ('কানেট চৌরি নিল অধরাতী'—২, 'জো সো চৌর সৌ দুষাধী'-৩৩) এবং দস্যুবৃত্তি ('বাট অভঅ খাণ্টা বি বলআ'—৩৮, 'অদঅ দঙ্গালে দেশ লুড়িউ'—৪৯)। তবে এই তির্যক জীবিকা একেবারে বাধাহীন ছিল না। দস্যুতস্করের উপদ্রব নিবারণে সেকালেও প্রহরীনিয়োগ ('সুণ বাহ তথতা পহারী'—৩৬) ও তালাচাবি ('কোঞ্চা তাল'—৪)র ব্যবস্থা ছিল, এবং চোর ধরার জন্য দারোগা ('দুষাধী'৩৩) ছিল, পথে ঘাটে থানা (১৫) বা কাছারি ('উআরি'—১২) ছিল।

জীবনযাপন : চর্যাগীতিতে দৈনন্দিন জীবনের যে ছবি পাওয়া যায় তার পটভূমি প্রধানত নিম্নশ্রেণীর জনগণ। কবি ও তাঁদের লক্ষ্য দল (target group) নিম্নশ্রেণীর বলেই বোধহয় নিম্নশ্রেণীর জীবনযাত্রার রূপকই বেশী ব্যবহৃত হয়েছে। সেকালের পারিবারিক কাঠামো ছিল যৌথ প্রকৃতির। শ্বশুর-শাশুড়ী-ননদ-শালী-স্ত্রী পুত্রবধূ ('বহুড়ী') সকলকে নিয়ে এই পারিবারিক সংগঠন। একাধিক চর্যায় (২,৪,১১) এই যৌথ প্রকৃতির-পারিবারিক কাঠামোর ইঙ্গিত আছে। এই পারিবারিক সম্পর্ক সম্ভবত বেশ দৃঢ়বদ্ধ ছিল। পরিবারের মধ্যে থেকে প্রকাশ্যে ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারের তেমন অবকাশ ছিল না। তাই কাহ্ন যখন ডোম্বীর প্রতি আসক্ত হন তখন তাঁকে পরিবারের শাশুড়ী-ননদ-শালী প্রভৃতি সকল পরিজনকে হত্যা করে (১১) গৃহত্যাগী হয়ে তবে প্রেমিকার সঙ্গে মিলিত হতে হয়। অন্যদিকে পুত্রবধূ মনে মনে পরপুরুষের প্রতি আসক্ত হলেও তাকে প্রকাশ্যে পারিবারিক আনুগত্য স্বীকার করতে হয় এবং প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য শ্বশুরের নিদ্রাকর্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এছাড়া, চর্যাগীতিতে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ প্রসঙ্গে যে আচার-অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে তার সঙ্গে আধুনিক বাঙালি সমাজের সামঞ্জস্য বিদ্যমান, অর্থাৎ আধুনিক কালেও উক্ত উপলক্ষে যে সব সামাজিক অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, তা আসলে প্রায় হাজার বছরের পুরাতন জীবনাচরণেরই অনুবৃত্তি। সন্তান প্রসবের জন্য একটি পৃথক আঁতুড় ঘরের ব্যবস্থা সেকালেও ছিল। উপযুক্ত আঁতুড় ঘরের অভাবে যে নবজাতকের প্রাণ বিপন্ন হবার আশঙ্কা ছিল কুক্কুরীপাদের চর্যায় তার ইঙ্গিত আছে:

ফেটলেউ গো মাএ অন্তউড়ি চাহি।
জা এথু বাহাম সো এথু নাহি॥

Scanned with CamScanner

পহিল বিআণ মোর বাসনয়ূড়া।
নাড়ি বিআরন্তে সেব বাপুড়া ॥(২০)

বাঙালি হিন্দু সমাজে মৃতদেহ সৎকারের যে রীতি প্রচলিত আছে ৫০ সংখ্যক চর্যায় তারও কিছু আভাস পাওয়া যায় :

চারি বাসে তাভলা রেঁ দিআঁ চণ্ডালী।
তঁহি তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দ সগুণ শিআলী ॥
মারিল ভবমত্তা রে দহদিহে দিধলি বলী।
হের সে শবরো ণিরেবণ ভঈলা ফিটিলি যবরালী ॥

চার বাঁশের চাঁচারি দিয়ে খাট গড়া হল। তাতে তুলে শবরকে দাহ করা হল, শকুন শিয়াল কাঁদতে লাগল। ভবমত্তকে মারা হল, দশ দিকে পিণ্ড দেওয়া হল। শবর নিশ্চিহ্ন হল, তার শবরালিও ঘুচল।

বিবাহের উদ্যোগ ও পদ্ধতির মধ্যেও একালের সঙ্গে সেকালের বেশ মিল ছিল। বাদ্যভাণ্ড সহযোগে সাড়ম্বর বিবাহযাত্রা, যৌতুক গ্রহণ, যুবতী রমণীদের বাসর জাগা—একালেও যেমন, সেকালেও তেমনি প্রচলিত ছিল। কাহ্নপাদের একটি চর্যায় (১৯) সেকালের বিবাহযাত্রার একটি সুন্দর ছবি পাওয়া যায় :

ভব নির্ব্বাণে পড়হ মাদলা।
মণ পবণ বেণি করণ্ড কসালা ॥
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বি বিবাহে চলিআ ॥
ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম ॥
অহিণিসি সুরঅ পসংগে জাঅ।
জোইণি জালে রএণি পোহাঅ ॥

এই ধরনের আড়ম্বরবহুল বিবাহ ছাড়াও সেকালে ডোম প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর সম্প্রদায়ের মধ্যে 'সাঙ্গা' বা বিধবাবিবাহের প্রচলন ছিল, কাহ্নের দুটি চর্যায়—'আলো ডোম্বী তোএ সম করিব ম সাঙ্গ'(১০), 'চলিল কাহ্ন মহাসুহ-সাঙ্গে' (১৩)—তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শবর-পাদের দুটি চর্যায় (২৮,৫০) সেকালের আদিবাসীদের দাম্পত্য জীবনের সুখসমৃদ্ধ চিত্র পাওয়া যায়। পাহাড়ের উপরে টিলায় শবরদম্পতির বাস। বাড়ির পাশেই কাপাস আর ধানের ক্ষেত। কাংনি ধান পেকে উঠলে তার থেকে তৈরি মাদক পানীয়

Scanned with CamScanner

পান করে শবর-শবরী জ্যোৎস্নারাতে প্রমত্ত হয় এবং মিলনসুখে রত হয়।

হেরি যে মেরি তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।
যুকড় এসে রে কপাসু ফুটিলা।
তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না বাড়ি ভাএলা।
ফিটেলি অন্ধারী রে অকাশ ফুলিআ॥
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা।
অণুদিণ সবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভেলা॥ (৫০)

শবর-শবরীর দাম্পত্য জীবনে সাময়িক ভুল বোঝাবুঝির অবকাশে কখনো আবার মধুরতর বৈচিত্র্য আসে। শবরী বিচিত্র বসনভূষণে সজ্জিত হওয়ায় শবর তাকে চিনতে না পেরে পরনারী বলে ভুল করে উন্মত্ত হয়ে ওঠে, শবরী তখন অনুনয় করে বলে:

উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহৌরী।
নিঅ ঘরিণী ণামে সহজ সুন্দারী। (২৮)

তারপর তিনধাতুর খাট পেতে তাতে উভয়ের মিলনশয্যা রচিত হল। তারপর কর্পূরবাসিত তাম্বূল চর্বণ করে শবরদম্পতি নিবিড় মিলনে রজনী অতিবাহিত করল। এই বর্ণনার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যাই হোক, শবর-শবরীর দাম্পত্য জীবনযাপনের একটি বিশ্বাস্য চিত্র হিসাবে এর বাস্তব মূল্য অপরিসীম।

আমোদ-প্রমোদ : চর্যাগীতির কতকগুলি অংশে সেকালের বাঙালিরা অবসর সময়ে, উৎসবে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যে ভাবে কালাতিপাত করত তার আভাস পাওয়া যায়। অবসর বিনোদনের অন্যতম প্রধান উপায় ছিল দাবাখেলা ("নয়বল"-১২)। সেকালের দাবাখেলার রীতিপদ্ধতির আভাসও উক্ত চর্যায় (১২) আছে :

পহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মারিউ।
গঅবরেঁ তোলিআ পাঞ্চজনা ঘালিউ॥
মতিএঁ ঠাকুরক পরীনিবিত্তা।
অবশ করিআ ভববল জিতা॥

প্রথম তুড়ে বড়ে মারা হল, গজ দিয়ে পাঁচজনকে ঘায়েল করা হল। মন্ত্রীকে দিয়ে ঠাকুরকে (রাজাকে) ঘিরে খেলা জয় করা হল।

অবসরের সময় মদ্যপান সেকালের অন্যতম সামাজিক ব্যসন ছিল। যে সমাজের অধিকাংশ মানুষই ছিল শ্রমজীবী, সেখানে দৈহিক ক্লান্তি অপনোদনের জন্য ব্যাপক মদ্যপানের অভ্যাস প্রচলিত থাকাই স্বাভাবিক। সমাজজীবনে এই ব্যাপক মদ্যাসক্তিকে

Scanned with CamScanner

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

চর্যাপদ

১) চর্যাপদ কে আবিষ্কার করেন কত খ্রিষ্টাব্দে এবং কোথা থেকে?

উঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, ১৯০৭ খ্রিঃ নেপালের রাজদরবার থেকে।

২) চর্যাপদ কবে কোথা থেকে কি নামে প্রকাশিত হয়?

উঃ- ১৯১৬ খ্রিঃ কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 'হাজার বছরের পুরান বাঙালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে প্রকাশিত।

৩) চর্যাপদের সংস্কৃত টীকার নাম কি? তার রচয়িতা কে?

উঃ- নির্মলভীরা টীকা। টীকাকার হলেন মুনিদত্ত।

৪) চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদ কে করেছিলেন এবং কে এই অনুবাদ আবিষ্কার করেছিলেন?

উঃ- কীর্তিচন্দ্র চর্যার তিব্বতী অনুবাদ করেন, প্রবোধচন্দ্র বাগচী তা আবিষ্কার করেন।

৫) তিব্বতীতে মূল চর্যাগীতির অনুবাদ কে করেন? চর্যাপদের ফটোকপি কে ~~সংরক্ষন~~ সংস্করন করেন?

উঃ- মূল চর্যাগীতির অনুবাদক ~~শিলা~~ শীলাচার্য। ফটোকপি ~~সংরক্ষন~~ সংস্করন করেন নীলরতন সেন।

৬) চর্যাগানে মোট কতগুলি পদ পাওয়া যায়? কবির সংখ্যা কত?

উঃ- ৪৬½ পদ পাওয়া যায়, — ২৪ জন কবি আছে।

Scanned with CamScanner

৭) চর্যার পুথির উপর কি লেখা আছে?

উ:- চর্যাচর্যবিনিশ্চয়।

৮) চর্যার প্রথম কবি কে? চর্যার আদি কবি কে?

উ: প্রথম কবি লুইপা। আদি কবি মীননাথ।

৯) চর্যাপদ নিয়ে আলোচনা করেছেন এমন দুজন অবাঙালী কে? চর্যাপদের ভূমিকা কে রচনা করেন?

উ:- শান্তি ভিক্ষু, রাহুল সাংকৃত্যায়ন। ভূমিকা রচনা করেন ডাঃ জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী।

১০) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের কি নামকরন করেছিলেন? চর্যাপদের মূল বিষয়বস্তু কি?

উ:- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের নাম দেন চর্যাচর্যবিনিশ্চয়।
মূল বিষয়বস্তু হল বৌদ্ধসহজিয়া সিদ্ধাচার্যের গূঢ় সাধনপ্রনালী।

১১) চর্যাপদ কোন যুগের সৃষ্টি? কারা চর্যাপদ রচনা করেন?

উ: পালযুগের সৃষ্টি। বৌদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্যরা।

১২) চর্যাপদের পুথির নাম কি?

চর্যাগীতিকোষবৃত্তি।

১৩) চর্যাপদ কবে রচিত হয়েছিল?

উ: মহম্মদ শাহীদুল্লাহ এর মতে খ্রিষ্টীয় অষ্টম - দ্বাদশ শতাব্দী।

উ. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে দশম - দ্বাদশ শতাব্দী।

Scanned with CamScanner

বিষয় — চর্যাপদ

মূল্যমান — ২০

সময় — ৩০ মিনিট

১/ চর্যাপদের ভাষাকে হিন্দি বলে অনুমান করেন কে ?

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

২/ চর্যাপদের ইংরেজি অনুবাদক কে ?

পি. সি. বাগচী

৩/ মেখলাটীকা কার রচনা ?

আচার্যপাদ

৪/ চর্যাপদের ফোটকপি কে সংরক্ষন করেন ?

নীলরতন সেন

৫/ চর্যার কোন পদকারের সঙ্গে বিখ্যাত অতীশ দীপঙ্করের সাক্ষাৎ হয় ?

লুই পা

৬/ ~~ত্রি~~ চর্যাপদের ত্রিবর্ষী ~~হ~~ কবি কে ?

ভুসুকু পা

৭/ ~~নবচ~~ নবচর্যাপদ কবে আবিষ্কৃত হয় ?

ক) ১৯১৬ খ) ১৯০৭ গ) ১৯৬৩ ঘ) ১৯৮৯

৮/ কে প্রথম প্রমান করেন চর্যাপদের ভাষা বাংলা ?

ক) বিধুশেখর শাস্ত্রী খ) সুকুমার সেন গ) সুনীতিকুমার ঘ) শহীদুল্লাহ্

৯/ চর্যাপদের একজন মহিলা কবির নাম লেখো।

কুক্কুরী পা

১০/ চর্যাপদে যে ফুলের কথা আছে —

ক) পদ্ম খ) গোলাপ গ) কার্পাস ঘ) পলাশ

Scanned with CamScanner

১১/ হৃদয়ে অবস্থিত চক্রের নাম কি ?

ক) সম্ভোগচক্র খ) ধর্মচক্র গ) সহজচক্র ঘ) নির্মানচক্র

১২/ চর্যাপদ নিয়ে লেখা একটি আধুনিক উপন্যাসের নাম লেখো।

সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন'।

১৩/ চর্যাপদের প্রাপ্ত পুথিতে কোন পদটি সর্বাধিক পাওয়া গেছে ?

ক) ১১ খ) ৯৬ গ) ২৩ ঘ) ৩২

১৪/ চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদের টীকা কে রচনা করেন ?

ক) প্রবোধচন্দ্র বাগচী খ) মুনিদত্ত গ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ) কীর্তিচন্দ্র

১৫/ চর্যাপদের ভাষাকে 'খিচুড়ি ভাষা' কে বলেছিলেন ?

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

১৬/ চর্যাপদে মোট কয়টি প্রবাদবাক্য আছে ?

ক) ৬ খ) ৮ গ) ১০ ঘ) ২১

১৭/ চর্যার পুথিটি কোন অক্ষরে লিখিত ?

ক) নাগরী খ) বাংলা গ) কুটিল ঘ) অবহট্ট।

১৮/ চর্যার পুথির মলাটে কি নাম লেখা ছিল ?

চর্যাচর্যবিনিশ্চয়

১৯/ চর্যার পুথির প্রকৃত নাম কি ?

ক) চর্যাগীতি খ) চর্যাচর্যবিনিশ্চয় গ) চর্যাগীতিকোষবৃত্তি ঘ) চর্যাচর্যটীকা

২০/ মুনিদত্তের টীকাটি কোন ভাষায় লেখা ?

সংস্কৃত।

Scanned with CamScanner